সধবার একাদশী লেখা হয়েছিল তৎকালীন নগর কলকাতার বাবুসমাজের বিকৃতি ব্যভিচারের বীভৎসতাকে তুলে ধরার জন্যই। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা *নববাবুবিলাস, নববিবিবিলাস; কলিকাতা কমলালয়* কিংবা তারও কিছু আগে বেনামে লেখা 'বাবু প্রবন্ধ' (*সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় ১৮২১-এ প্রকাশিত) প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে প্রথম 'বাবু'দের নিয়ে ব্যঙ্গমূলক আখ্যান শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে টেকচাঁদ ঠাকুরের *আলালের ঘরের দুলাল,* কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম *প্যাঁচার নক্শা* কিংবা মধুসূদন দত্তের *একেই কি বলে সভ্যতা?* প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে বাবুসমাজের বিকৃতি ব্যভিচারের বিচিত্র পরিচয় ফুটে উঠেছে। এই ধারারই একটি চমৎকার গ্রন্থ হল দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী*। মনে রাখতে হবে এই ধারার লেখকদের প্রত্যেকেই ছিলেন বাবুসমাজের মানুষ। স্বজাতির বিচ্যুতি ও বিকৃতিকে তাঁরা যখন ব্যঙ্গের চাবুকে ফুটিয়ে তুলতে চান—তখন কোথাও সেটা হয়ে যায় আত্মবীক্ষারই সামিল। ফলে সেই চাবুকে ততখানি জ্বালা থাকে না বরং থাকে আত্মসমালোচনা, থাকে ব্যঙ্গের সঙ্গে চোখের জলও। *সধবার একাদশী* পড়লে পাঠকের সেই উপলব্ধিই হবে। নিমচাঁদের মধ্যে দিয়ে দীনবন্ধু আত্মপীড়ন আর আত্ম-অনুশোচনার সংলাপই শুনিয়েছেন।

নিমচাঁদের মতো প্রতিভাবান শিক্ষিত যুবকদের ওই ব্যর্থতার কারণ কী—শুধুই কি

মদ্যপান আর বারাঙ্গনা-সঙ্গ? মনে হয় না। ঔপনিবেশিক কলকাতার শিক্ষা-সংস্কৃতি আর অর্থনীতির গভীরে ডুব দিলে হয়তো অন্য কোনো উত্তরের সন্ধান মিলবে। সে-বিষয়ে আপাতত না ঢুকে আমরা দেখে নেব বাবু কালচারের নানান দিকগুলিকে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাবু' প্রবন্ধে (*লোকরহস্য*) বিষ্ণুর সঙ্গে সাদৃশ্যবশত বাবুদের দশ অবতারের কথা বলেছেন—কেরানী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দি, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সম্বাদ-পত্রসম্পাদক এবং নিষ্কর্ম্মা'।[১২] *সধবার একাদশী*-তে কয়েকটি অবতারের সন্ধান পাই। কেনারাম ডেপুটি একই সঙ্গে ব্রাহ্ম এবং হাকিম। গোকুলচন্দ্রও একদা কালাপাহাড়ি 'বাবু' ছিলেন, পরে তিনি দায়িত্ববান ব্রাহ্ম হয়েছেন। নকুলেশ্বর উকিলের প্রতিনিধি। অটলের পিতা জীবনচন্দ্র যে বিষয়সম্পত্তি করেছেন, তা মুৎসুদ্দি-বেনিয়ানের রোজগারের পথ ধরেই হয়েছে। আর অটল এবং নিমচাঁদ নিষ্কর্মা যুবকদের প্রতিনিধি। এই বাবুদের অন্তঃসারশূন্য জীবনই চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে নানান দিক থেকে।

১৮২১-এ *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় দু কিস্তিতে 'বাবুর উপাখ্যান' নামে একটি গদ্য প্রকাশিত হয়। বেনামী এ-রচনাটি ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। 'বাবুর উপাখ্যান'-এ রাজচক্রবর্তী নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণ ইংরেজ কুঠি অফিসের দেওয়ানি করে বিপুল অর্থ রোজগার করেন, তার ছেলের নাম তিলকচাঁদ। ভবানীচরণ এই গদ্যে নব্যবাবু তিলকচাঁদের বেড়ে ওঠা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনচর্চার বিবরণ দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে বাবু বিষয়ক আখ্যান বা বৃত্তান্ত এটিই প্রথম। এর বছর চারেক পরে ভবানীচরণ স্বনামে লেখেন *নববাবু বিলাস* (১৮২৫)। *নববাবু বিলাস ঠিক যেন* 'বাবুর উপাখ্যান'—এর একটি বিস্তৃত আখ্যান। কলকাতার বুকে কীভাবে 'বাবু'দের উৎপত্তি হল—অঙ্কুর থেকে কীভাবে বাঙালি-যুবা সর্ব-বিদ্যা-বিশারদ 'বাবু' হয়ে উঠতে লাগল, তার নিপুণ ছবি আঁকা আছে *নববাবু বিলাস* গ্রন্থে।[১৩]

ভবানীচরণ দেখিয়েছেন নতুন মহানগর কলকাতায় কীভাবে ইংরেজ বেনিয়াদের সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে স্বর্ণকার, চর্মকার, কর্মকার ইত্যাদির 'বেতনোপভুক হইয়া' কিংবা সরদারি, চৌকিদারী, জুয়াচুরি, পোদ্দারি করে, কিংবা 'পৌরহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্য ভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিংবা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন', তাঁরা তাঁদের পুত্রগণকে 'বাবু' বানানোর অভিলাষে পাঁচ বছর বয়স থেকে শিক্ষার জন্য গুরুমশাই-এর কাছে পাঠান।

সধবার একাদশী-তে এরকম কোনো 'বাবু'দের বাবু হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত নেই, তবে এ নাটকের কেন্দ্রেও আছে এক বাবু—অটল। সেই অটলের বাবু হয়ে ওঠার কিছু কিছু সূত্র নিশ্চয়ই আছে। অটলের পিতা জীবনচন্দ্র আর পাঁচজনের মতোই ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে বিপুল অর্থ রোজগার করেছেন তারপর হয়তো কোনো এক মফস্‌সল থেকে এসে কাঁসারিপাড়ায় তিনি বাড়ি তৈরি করেছেন। কাঁসারিপাড়া তৎকালীন কলকাতার নেটিভ 'ছোটোলোক' বা গাঁইয়াদের বসবাসের স্থান ছিল। এই কাঁসারিপাড়ার সঙের নাচের শোভাযাত্রা ছিল বিখ্যাত। যাই হোক জীবনচন্দ্র বিপুল অর্থ ও সম্পত্তি-উপার্জনের

পর কাঁসারিপাড়ায় বাড়ি ও ব্যবসার বৈঠকখানা করলেন। হয়তো জীবনচন্দ্রের মতোই গোকুলবাবু, নকুলবাবুরা পিতৃপুরুষের হাত ধরে কলকাতা নগরে অদূর অতীতে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তারপর জীবনচন্দ্রের মতোই তাঁরা অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছেন।

জীবনচন্দ্র তার সন্তানকে পড়াশোনা শেখানোর চেষ্টায় কসুর করেননি। *নববাবু বিলাস* গ্রন্থে ভবানীচরণ দেখিয়েছেন এই বাবুদের 'বিদ্যার পরিচয়'। পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করে এই বালক-বাবুগণ গ্রামগঞ্জ থেকে কলকাতায় আসা কায়স্থজাতীয় গুরুমহাশয়ের কাছে প্রথম বাংলা বিদ্যাশিক্ষা করে। অক্ষরজ্ঞান ও অঙ্করাশি চেনা শেষ হলে পর বাবুগণ কোনো মুন্‌সির নিকট পারসি শিখল এবং বারো তেরো বছর বয়স হলে 'পর তারা ইংরেজি শিক্ষার নিমিত্ত কোনো স্কুল মাস্টারের তত্ত্বাবধানে রইল। ভবানীচরণের বয়ান অনুসারে এই ইংরেজি মাস্টাররা ছিলেন মূলত 'কোন হিন্দুস্থানী বেশ্যা কিম্বা বাঙ্গালি বেশ্যা অথবা মেথরানী-গর্ভজাত একজন সাহেব'। *সধবার একাদশী*-তে আমরা অটলের শিক্ষা প্রসঙ্গে জেনেছি, সে ছোটোবেলায় দু-একটি স্কুলে ভরতি হয়েছিল।

অটলের স্ত্রী কুমুদিনীর সংলাপে পাই— 'তোর ভাই আবার কোন্ কালে কলেজে পড়লে? আদরের ঢেঁকি কলেজে নিলে না, তাই গৌরমোহন আড্ডির স্কুলে দুই-একখান বয়ের পাত উল্‌টিচ্‌লো আর হেয়ার সাহেবের স্কুলে মাস কত পড়েচ্‌লো।' হ্যাঁ, বাবুদের বিদ্যাশিক্ষার দৌড় ছিল ওরকমই। কিন্তু স্কুলের শিক্ষা বাবুদের হজম হতো না। যে-কোনো কারণেই হোক খুব দ্রুত বাবুদের স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হতো। নিমচাঁদের কাছে অটল যখন বড়াই করে বলে— 'আমরা ও প্লে-টা হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়েছিলাম— আমরা অনেকবার পড়িচি—', তখন সেকথার উত্তরে নিমচাঁদ বলে— 'তুই ব্যাটা আর বিদ্যে খরচ করিস্‌নে— তোর বাপ্ ব্যাটা বিষয় করেছে, বসে বসে খা—পাঁচ ইয়ারকে খাওয়া—মজা মার। হেয়ার সাহেবের স্কুলে তোর কোন্ বাবা সেক্সপিয়ার পড়িয়েছিল? তুই কোন্ ক্লাসে পড়িছিস্?'

অটল উত্তর দেয়—'In the Baboo's Class'

তখন নিমচাঁদের তীব্র ব্যঙ্গ ছিল—'Rather in the King's hell, হেয়ার সাহেবের হেড্ মাষ্টার জ্যান্তো বড়মান্‌ষর ছেলে ব্যাটারা রমানাথের এঁড়ে, আপনারাও পড়বে না, কারো পড়তে দেবেও না—তাইতো একটা বাবুজ কেলাস ক'রে সব কেলাস থেকে রমানাথের এঁড়ে বেচে সেই কেলাসে দিয়েছিল—'

নিমচাঁদের এই সংলাপে বোঝা যায় বিশেষ 'বাবুজ কেলাস' আসলে বিদ্যাবুদ্ধিহীন কিন্তু অর্থবান আদুরে বাবুদের জন্যই বানানো হয়েছিল। বছরের পর বছর উত্তীর্ণ না হয়ে তারা পড়াশোনা ছেড়ে দিত নয়তো স্কুল থেকে বিতাড়িত হতো। তারপর বাড়িতেই কোনো ফিরিঙ্গি সাহেবকে ধরে এনে ইংরেজি বুলি শেখানোর আয়োজন হতো। এভাবেই তো অটলের ইংরেজি শিক্ষা। *মার্চেন্ট অফ ভেনিস* তার কাছে 'Marchant of Venerials' হয়ে যায়। ছেলের এই ইংরেজি বিদ্যারই গুণগান গায় তার পিতা জীবনচন্দ্র। গোকুলবাবুকে সে বলে— 'লেখা পড়া ভাল করে শিখলে না, কিন্তু তবু ইংরিজি পারে মন্দ নয়—অনেক বই কিনেচে।'

যাই হোক ফিরিঙ্গি সাহেবদের কাছে দুটো-একটা ইংরেজি বুলি শেখা হলে অতঃপর বাবুগণ পিতার ব্যবসার কুঠিবাড়ি কিংবা বৈঠকখানায় গিয়ে বসেন। বাবুদের পছন্দমতো ফ্যাশানদুরস্ত পোশাক পরিচ্ছদ, যানবাহন প্রস্তুত হয়, বাবুদের বাবুগিরিশিক্ষা এই সময় চলতে থাকে। উত্তমরূপে বাবু হতে গেলে তার কী-কী গুণ থাকতে হয়, কী কী অভ্যাস করতে হয়, সে-সব শিক্ষা দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ খোসামুদে ব্যক্তি এসে জোটে। তারা বাবুকে উপদেশ দিয়ে নানারকম বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলে। মদ্যপান থেকে বারাঙ্গনা-গমন সম্পর্কে বাবুদের বিদ্যাশিক্ষা তাদেরই হাতে। অবশেষে 'বাবু' সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়ে উঠলে তার চারপাশে মো-সাহেবরা এসে জোটেন। বাবুর অগাধ বিষয়-সম্পত্তিতে ওই মোসাহেবগণ প্রতিপালিত হতে থাকেন।

সধবার একাদশী-তে বাবু অটলের চারপাশে এইরকম ইয়ার-বক্সিরূপী খোসামোদিদের ভিড় আমরা দেখেছি। নিমচাঁদ, ভোলা কিংবা রামমাণিক্য—এরা সেই ইয়াররূপী তোষামোদী। অটলের মাথায় কাঁটাল ভেঙে তাদের দিনযাত্রা নির্বাহ হয়। নিমচাঁদ একবার অটলকে বলে— 'তোর বাপ ব্যাটা বিষয় করেছে, ব'সে ব'সে খা— পাঁচ ইয়ারকে খাওয়া—মজা মার।' এই হল 'বাবু' অটল সম্পর্কে নিমচাঁদের প্রকৃত মূল্যায়ন।

অথ বারাঙ্গনা সংবাদ

সধবার একাদশী নাটক যে সমকালীন ভদ্রলোকের সাহিত্যরুচির মানদণ্ডে 'অশ্লীল', 'কুরুচিপূর্ণ' বলে পরিগণিত হয়েছিল তার অন্যতম কারণ ছিল বারাঙ্গনা প্রসঙ্গ। নাটকটির অভিনয়ের উপযুক্ত স্থান হল কোনো বেশ্যাপল্লি এবং বেশ্যা ও তাদের খদ্দেররাই এ নাটকের উপযুক্ত দর্শক—এমন কঠিন ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা লালবিহারী দে করেছিলেন ওই বারাঙ্গনা-প্রসঙ্গের বার-বাড়ন্তের কারণেই। যদিও এই নাটকের কাহিনিতে বারাঙ্গনার যে প্রসঙ্গ রয়েছে, মনে হতে পারে সেটি বাবুগিরির অঙ্গ—এই হিসেবেই এসেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু বাবু কালচারের অঙ্গ হিসেবেই নয়, এ নাটকে বারাঙ্গনার বৃত্তান্তকে আমরা উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির একটি বিষময় ফল হিসেবেই দেখতে চাই।

কলকাতার বুকে ইংরেজ আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বারাঙ্গনাবৃত্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে। এর নানা সমাজতান্ত্রিক কারণ ছিল। বর্গি আক্রমণের আঘাত গ্রামগঞ্জে যে-ভাবে নেমে আসে, তাতে যবন কর্তৃক ধর্ষিতা মেয়েদের শেষ পর্যন্ত বারাঙ্গনাবৃত্তি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। তেমনি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো বিপুল মহামারীর দিনে গ্রামবাংলার দরিদ্র হা-ঘরে পরিবারের মেয়েরা দাসী হিসেবে বিক্রি হয়ে যেত। এবং আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের শুরুর সময় জুড়ে এভাবেই গ্রামগঞ্জ মফস্‌সল থেকে মেয়েরা নানা হাতবদল হয়ে এসে পৌঁছয় কলকাতা বা কলকাতার উপকণ্ঠে। নতুন নগর কলকাতায় তখন বারাঙ্গনা-বৃত্তির চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *অশ্রুত কণ্ঠস্বর : ঔপনিবেশিক বাঙলার বারবণিতা সংস্কৃতি* গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।[১৪] তিনি দেখিয়েছেন ঔপনিবেশিক

কলকাতার উপকণ্ঠে ও কলকাতার বেশ্যাপল্লিগুলিতে কীভাবে কোন্ পথে গ্রামবাংলার মেয়েরা গণিকা হয়ে উঠত। গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক বিপর্যয় একটা বড়ো কারণ ঠিকই, কিন্তু তারই সঙ্গে তৎকালীন হিন্দুর নানান কুসংস্কারও এর জন্য সমান দায়ী। কুলীন বাল-বিধবা অথবা অবিবাহিত যে-সব কন্যা কিংবা স্বামী-পরিত্যক্তা রমণী—এরা বাবার বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে সুযোগ খুঁজতো কীভাবে সেখান থেকে বের হয়ে আসা যায়। এদের জন্য আবার ছিল নানান মতলবী মানুষদের হাজারো প্রলোভন এবং শরীরী জৈবিকতার হাতছানি। অনেকেই পাড়ার কোনো মাসি বা পিসির কথায় ঘর ছেড়ে আসে, তারপর আর ঘরে ফেরা হয় না, হাত ঘুরে তারা এসে পৌঁছয় কলকাতা ও তার উপকণ্ঠের গণিকালয়ে।

এই 'মাসি' 'পিসি'রা হল দালাল বা কূটনী। কলিকাতার বিভিন্ন গণিকালয়ে মেয়ে সাপ্লাই দেওয়া ছিল তাদের কাজ। বাংলা সাহিত্যে এই কূটনীদের আমরা অনেক দেখা পেয়েছি। পাঠকের এক্ষুনি মনে পড়বে ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর*-এর বিখ্যাত মালিনী মাসির কথা। মালিনীকে সে সময়ের প্রেক্ষিতে উনিশ শতকীয় কূটনীদেরই পূর্বজ বলা যেতে পারে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *দূতীবিলাস* (১৮২৩) নামে একটি 'আদিরস ভক্তিরস ঘটিত' কাব্যই লিখেছেন, যেখানে দূতী হিসেবে নাপতিনী, উড়িস্যা গোপিনী, রাঁধুনী, পাঠিনী, দাসিনী প্রভৃতির কথা আছে। নানা ছলে বলে তারা কীভাবে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটায় ভবানীচরণের কাব্যে সেটাই ছিল উপজীব্য। দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* নাটকে এমনই এক কূটনী বা দালালের চরিত্র নিশ্চয় পাঠকের মনে পড়বে—পদী ময়রাণী যে ক্ষেত্রমণিকে ফুসলিয়ে রোগ সাহেবের কামরায় নিয়ে আসে। কিংবা মনে পড়বে মাইকেলের *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ*-এর পুঁটির কথা, যে ফতিমাকে ও ফতিমার মতো অনেককেই প্রলোভন দেখিয়ে ভক্তপ্রসাদের কামনার কাছে সঁপে দিয়েছে। নাটকটিতে গদা-র সঙ্গে ভক্তপ্রসাদের এক-টুকরো সংলাপ এখানে খুব প্রাসঙ্গিক হবে :

গদা কত্তামশাই, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো!

ভক্ত। কোন্ ইচ্ছে?

গদা। আজ্ঞে, ঐ যে ভট্‌চাজ্যিদের মেয়ে। আপনি যাকে—(অর্ধোক্তি)—তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।

পুঁটির সংলাপেও এরকম স্বগতোক্তি পাই—'আজ না হবে তো ত্রিশ বচ্ছর ওর কম্ম কচ্চি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার ঠিকানা নাই।' এই সংলাপ থেকে বোঝা যায় সেকালে কূটনী বা দালালি ছিল একটা রীতিমত পসার জমানো ব্যবসা। প্রধানত এককালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যারা 'নষ্ট' তক্‌মা পেয়ে, গণিকালয়ে যায়, খুব দ্রুত গত-যৌবনা হয়ে পেটের দায়ে তারাই হয়ে ওঠে 'মাসি' বা 'পিসি' অর্থাৎ কূটনী।

সধবার একাদশী-তে কোনো কূটনী-চরিত্র নেই, তবে একজন 'দাসী' এবং একজন 'হিজড়া'র সন্ধান পাই। এই 'দাসী' প্রকৃত অর্থেই দাসী অর্থাৎ বড়লোক বাড়ির ঝি।

নিমচাঁদ তাকে — 'তুই কুটনী হতে পারিস্।' বললে ক্ষিপ্ত হয়ে সেই দাসী তাকে — 'তোর মা বন্ গিয়ে হোক্—আঁটকুড়ীর ব্যাটা, মাতাল মদখোর....' ইত্যাদি বলে গালাগাল দেয়। যাই হোক, নিমচাঁদ মদের ঘোরে তাকে 'কুটনী' বলে ভুল করেছিল। নাটকের শেষে অটলকে দেখি তার খুড় শাশুড়ি অনঙ্গরঙ্গিনীকে ফুসলিয়ে আনবার জন্য একজন পেশাদার 'কুটনী' হিজড়েকে নিয়োগ করেছে।

তো, এভাবেই উনিশ শতকের কলকাতা হয়ে উঠেছিল আর এক-রকমভাবে বারবণিতাদের শহর। একটি রিপোর্ট অনুসারে ১৮৫৩ সালে কলকাতায় বারবণিতার সংখ্যা ছিল ১২,৪১৯, ১৮৬৭-তে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০,০০০-এ।[১৫] নতুন শহর কলকাতার বুকে পাড়ি জমানো ছোটোখাটো ব্যবসায়ী ও অসংখ্য জীবিকার মানুষ যেমন ছিল বারবণিতাদের খদ্দের, তেমনি কলকাতার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একটা বড়ো অংশের কাছে বারাঙ্গনা-সংসর্গ ছিল সাধারণ ঘটনা। এছাড়া ছিল কলকাতার নব্যবাবুরা। বাবুগিরির স্ট্যাটাস হিসেবে ছিল উপপত্নী রাখার চল। যার যত টাকা, যে-যত ধনী তার উপপত্নীর সংখ্যাও ছিল তত বেশি। রাজনারায়ণ বসু ১৮৭৪-তে প্রকাশিত তাঁর *সে কাল আর একাল* গ্রন্থে লিখছেন :

> যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। সে কালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত; এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিয়াছে, ... বেশ্যাগমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ বেশ্যা সংখ্যার বৃদ্ধি। পূর্বে গ্রামের প্রান্তে দু এক ঘর বেশ্যা দৃষ্ট হইত; এক্ষণে পল্লিগ্রামে বেশ্যার সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি, স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও এই পাপ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে।[১৬]

কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর *হুতোম প্যাঁচার নকশা*-য় (১৮৬২) কলকাতাকে 'বেশ্যাসহর' বলে অভিহিত করে লিখছেন—'এমন পাড়া নাই যেথায় অন্তত দশ ঘর বেশ্যা নাই।'[১৭]

সধবার একাদশী যে-সময় ও যে-সমাজের ছবিকে তুলে ধরে, সেখানে মদ্যপান ও বারাঙ্গনা সমস্যা একটা তীব্রতম আকার ধারণ করেছিল। সে সমস্যা এমনই—যা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা যায় না। চিৎপুর রোডে গোকুলবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নিমচাঁদ সেটিকে 'পাবলিক হাউস' অর্থাৎ বেশ্যা বাড়ি ভেবে নিয়েছিল। যে-কোনো ভদ্রপাড়ার মধ্যে দু-এক ঘর পাবলিক হাউস তখন স্বাভাবিকই ছিল। তেমনি স্বাভাবিক ছিল বাবুদের উপপত্নী রাখবার প্রথা। নিমচাঁদ অটলকে বলে, কাঞ্চনকে সে রেখেছে কিনা ? উত্তরে অটল বলে—'বেটি তিন'শ টাকা মাসয়ারা চায়।' তখন নিমচাঁদ মন্তব্য করে—'তুচ্ছ কথা—তোমার বাবা যে বিষয় করেছেন, অমন বিষয় আমার থাক্‌লে আমি কাঞ্চনের গর্ভধারিণীকে রাখ্‌তেম।' কাজেই বোঝা যাচ্ছে—যার যত বিষয় সম্পত্তি, তাঁর উপপত্নীর সংখ্যা তত বেশি । শহরের সবথেকে দামি 'চিজ' কাঞ্চনকে রাখার জন্য অটল তাকে তিনশো টাকা মাসোয়ারা দেয়। মাস দুই তিনের মধ্যে কাঞ্চনের জন্য সে ত্রিশ হাজার

টাকা খরচ করে ফেলেছে। কোম্পানির কাগজ ভেঙে দশ হাজার টাকা দিয়ে কাঞ্চনের জন্য গহনা কিনে দিয়েছে। এ সব নিয়ে অটলের পিতা যতই অনুযোগ করুক, এটা অস্বীকার করা যায় না যে অটলের অধঃপতনের জন্য তার পিতা ও পরিবারই দায়ী। অটলের মা তার লাম্পট্যকে প্রশ্রয় দেয়। সেকালের কলকাতায় এটা খুবই স্বাভাবিক ও চলতি রীতি ছিল যে, বেশ্যাগমন ও উপপত্নী রাখবার জন্য খরচ পরিবার থেকেই জোগানো হত। অটলের বিরুদ্ধে তার বাবা কোনো কথা বললে, তাকে 'ত্যজ্যপুত্র' করবার ভয় দেখালে সে সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কাছে যায়। দেয়ালে মাথা কুটে মরবার ভয় দেখায়। তখন 'গোপালহারা' হওয়ার ভয়ে মা অটলের সব অন্যায় মেনে নেয়। মায়ের হাত থেকেই অটল মাসে মাসে তিনশো টাকা করে নেয় কাঞ্চনকে দেবার জন্য। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে অটলের আত্মহত্যা করবার চেষ্টা ইত্যাদি দেখে ভীত ও বিরক্ত কাঞ্চন বলে —'আমি চল্যেম বাছা, এমন খুনের কাছে ভদ্রলোকে থাকে?' এই বলে সে চলে গেলে অটলের মা পিছনে ছুটতে ছুটতে বলে—'যাস্ নে যাস্ নে, ও কাঞ্চন যাস্ নে। সৌদামিনী তোর দাদার কাছে রসিস্। ও কাঞ্চন, কাঞ্চন, ও কাঞ্চন, আমার মাতা খাস্ মা যাস নে, তোমায় না দেখলে গোপাল আমার গলায় দড়ি দেবে।' বাড়িতে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও উনিশ শতকীয় বাবুদের এই বেশ্যাবাড়ি অথবা বাগানবাড়িতে অভিসার নিয়ে সে কালে অনেক গল্প-কথাও তৈরি হয়েছিল। ঠিক যেমন তৎকালীন বেশ্যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল শ্রীরাধার রূপকে চন্দ্রাবলীর গল্প।

সধবার একাদশী নাটকে নিমচাঁদের মুখে আমরা 'চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ' কথাটা শুনেছি। কথাটা শ্রীকৃষ্ণের পরকিয়া প্রেমের সঙ্গে যুক্ত। রাধা সেই পরকিয়া নারী, যাকে ঘিরে যুগে যুগে বিভিন্ন স্থান ভেদে পরকিয়া প্রেমের রসালো কাহিনি গড়ে উঠেছিল। হিন্দি বলয়ের কৃষ্ণযাত্রা হোক কিংবা লেটো, ঝুমুর গান কিংবা বেশ্যাসংগীত—পরকিয়া নারীকে সেখানে রাধার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। উনিশ শতকের কলকাতায় বেশ্যালয়গুলির মধ্যেও অনেকরকম ভেদ ছিল। সোনাগাছির মতো বেশ্যাপল্লির পাশাপাশি ছিল সম্ভ্রান্ত পাড়ায় বিভিন্ন 'পাবলিক হাউস' যেখানে অনেকজন বারাঙ্গনা ভাড়া নিয়ে থাকতেন। বারাঙ্গনাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত—নৃত্য ও গীতে খুবই পটু, তাঁদের ছিল নিজস্ব প্রাসাদ। এছাড়া ছিল বাবুদের বাগানবাড়ি, যেখানে বাবুরা তাঁদের উপপত্নী বারাঙ্গনাদের রাখতেন। বাবুদের স্ত্রীকে ছেড়ে পরকিয়া বেশ্যাগমনের রীতিকে ঘিরে সেই সময় গড়ে উঠেছিল রাধা ও চন্দ্রাবলীর কথকতা। বাবুদের বঞ্চিত অবহেলিত স্ত্রী যেন উপেক্ষিতা রাধা, সেই রাধাকে ছেড়ে বাবুরূপ কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে অর্থাৎ বারাঙ্গনার বাড়িতে রাত্রিযাপন করছে। সেকালের বেশ্যা ও বাইজির গানের ভাষাতেও তাই উপেক্ষিত রাধার কথা এসেছে, এসেছে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জের কথা। হরুঠাকুরের বিখ্যাত গান—'আছে চন্দ্রাবলীর ঘরে।/ দেখে এলেম শ্যাম চাঁদেরে।' *সধবার একাদশী*-তে কুমুদিনী সৌদামিনীদের জীবন তো রাধারই মতো, এবং এই বঞ্চিত অবহেলিত রাধারাই তো শেষ পর্যন্ত কুল ত্যাগ করে বারনারী হয়ে ওঠে। হয়তো তাই লোকগানে,

খ্যামটা নাচে, বাইজি সংগীতে ওই বঞ্চিত অবহেলিত কুলরমণীদের যেন বঞ্চিত রাধার সঙ্গে একাকার করে দেওয়ার প্রবণতা থাকে। রাধার রূপান্তর যেন বারাঙ্গনা নারী হয়ে ওঠে।[১৮] *সধবার একাদশী* নাটকে কাঞ্চনের গানে যে নারীর তাপিত অন্তরের কথা বলা হয়েছে, সেই নারী তো রাধাই :

চলো লো সজনি সবে সরোজ কাননে যাই
সুশীতল সমীরণে জীবন জুড়াই;
বিনে নটবর, জ্বলে কলেবর, তাপিত অন্তর
পুড়ে হলো ছাই।

বিনে নটবর শরীর-মনের জ্বালা-পোড়া কাঞ্চনের মতো বারাঙ্গনাদের জীবনের ঘটনা নয়, এতো কুমুদিনী সৌদামিনীদের মতো স্বামী-পরিত্যক্তা পুরনারীদের অন্তরের কথা। দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *বেশ্যাসংগীত বাইজিসংগীত* বইটি যদি পাঠক পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন, সেকালের বেশ্যা ও বাইজি গানে মূলত পতি-বিরহ-কাতর আধুনিক রাধার রূপান্তরের ছবিই বেশি করে ধরা আছে।[১৯]